# ইসলামি শরিয়া
## কি? কেন? কিভাবে?

আবদুস শহীদ নাসিম

ISBN: 978-984-645-060-6

**দাম: ২০.০০ টাকা মাত্র**

**ইসলামি শরিয়া: কি? কেন? কিভাবে?** আবদুস শহীদ নাসিম ©Author, প্রকাশক: বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা সোসাইটি, পরিবেশক: বর্ণালি বুক সেন্টার-বিবিসি, ঢাকা। ফোন: ০১৭৫৩৪২২২৯৬, ১ম প্রকাশ: ১৬ এপ্রিল ২০১০ ঈসায়ী।

# সূচিপত্র


| বিষয় | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ০১ | ইসলামি শরিয়ার পরিচয় | ০৩ |
| ০২ | দীন ও শরিয়া | ০৩ |
| ০৩ | শরিয়া প্রণেতা কে? | ০৫ |
| ০৪ | শরিয়ার উৎস কি? | ০৬ |
| ০৫ | আল কুরআন | ০৭ |
| ০৬ | আস্ সুন্নাহ | ০৮ |
| ০৭ | ইজতিহাদ | ১০ |
| ০৮ | ইজতিহাদের নির্দেশনা ও সূচনা | ১২ |
| ০৯ | পূর্ণাঙ্গ ও অপূর্ণাঙ্গ মুজতাহিদ | ১৬ |
| ১০ | ইজতিহাদের প্রয়োগক্ষেত্র সমূহ | ১৭ |
| ১১ | ইজতিহাদ কখন করা হবে? | ১৯ |
| ১২ | ইজতিহাদের শর্তাবলি | ১৯ |
| ১৩ | ইজতিহাদি মতের সাথে দ্বিমত করার অধিকার | ২১ |
| ১৪ | ইজতিহাদ আইনের মর্যাদা লাভ করে কিভাবে? | ২১ |
| ১৫ | শরয়ী বিধান সমূহের প্রকারভেদ | ২৩ |
| ১৬ | মাকাসিদে শরিয়া (objectives of shariah) | ২৩ |
| ১৭ | ইসলামি শরিয়ার বৈশিষ্ট্য | ২৪ |
| ১৮ | ইসলামি শরিয়ার প্রয়োগক্ষেত্র সমূহ | ২৫ |
| ১৯ | ইসলামি শরিয়ার প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন | ২৫ |
| ২০ | শরিয়ার গুরুত্ব ও অখন্ডতা | ২৮ |
| ২১ | শরিয়া অধ্যয়ন সংক্রান্ত পরামর্শ | ৩০ |

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

# ইসলামি শরিয়াঃ কি? কেন? কিভাবে?

## ০১. ইসলামি শরিয়ার পরিচয়

ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা। ইসলামকে আল কুরআনে বলা হয়েছে 'দীন':

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ •

অর্থ: 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র কাছে দীন হলো ইসলাম।' (সূরা আলে ইমরান: আয়াত ১৯)

اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا •

অর্থ: আজ আমি তোমাদের জন্যে পূর্ণাঙ্গ (Perfect) করে দিলাম তোমাদের দীন, তোমাদের প্রতি সম্পূর্ণ (complete) করে দিলাম আমার অনুগ্রহ (অহি) এবং তোমাদের জন্যে দীন মনোনীত করলাম ইসলামকে। (সূরা মায়িদা: আয়াত ৩)

দীন মানে- সুনির্দিষ্ট বিশ্বাস ও দৃষ্টিভংগি ভিত্তিক জীবন-ব্যবস্থা, জীবন-বিধান; আনুগত্যের বিধান, জীবন যাপন পদ্ধতি। দীনের মধ্যেই আল্লাহ শরিয়া দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ দীনের মধ্যে তাঁর আনুগত্য করার পদ্ধতি, নিয়ম কানুন ও বিধি বিধান প্রদান করেছেন। আদেশ নিষেধ জারি করেছেন। অনেক বিষয় বৈধ ও হালাল করেছেন, আবার কিছু কিছু জিনিস হারাম ও অবৈধ করেছেন। অনেক ব্যাপারে সময় ও সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। - এই বিষয়গুলো হলো শরিয়া।

আল্লাহ এবং তাঁর রসূল মুহাম্মদ সা. দীন পালনে যেসব আইন-বিধান, নিয়ম-পদ্ধতি, হালাল-হারাম, সময় সীমা এবং বৈধ অবৈধের সীমারেখা প্রদান করেছেন সেগুলো এবং সেগুলোর মূলনীতির সমন্বিত রূপই ইসলামি শরিয়া।

শরিয়া একটি পরিভাষা। শরিয়া মানেই কুরআন-সুন্নাহ্‌র আইন ও বিধান।

## ০২. দীন ও শরিয়া

ইসলামের উপমা হলো একটি সর্বাঙ্গীন সুন্দর বৃক্ষ। এর মূল, শিকড় ও কান্ড হলো 'দীন'। এর শাখা প্রশাখা, পত্র পল্লব, ফুল ফল হলো 'শরিয়া'। অথবা

ইসলামের উদাহরণ হলো একটি ইমারত। এর ভিত, পিলার এবং ছাদ হলো দীন। এর নকশা, মাপ, অনুমোদনপত্র, পানি বিদ্যুত গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থা, বেসিন, টয়লেট, গোসলখানা, স্যুয়ারেজ ব্যবস্থা, রান্নাঘর, খাবার কক্ষ, বৈঠকখানা, বেডরুম এবং অন্যান্য ব্যবস্থা ও নিয়মাবলী হলো শরিয়া।

আবুল আ'লা মওদূদী বিষয়টিকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন এভাবে:

Deen stands for Belief and Faith. Submission to Allah by obeying His Orders and Commands and by following His Prophet.

Shariah means: The detailed code of conduct or the canons comprising ways and modes of worship, standers of morals and life and laws that allow and prescribe, that judge between right and wrong.[১]

আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি: আল্লাহ্‌র আনুগত্য করা বা নির্দেশ পালন করা হচ্ছে 'দীন'। সময় মতো সালাত আদায় করা বা নামায পড়া আল্লাহ্‌র একটি নির্দেশ। সুতরাং যিনি সালাত আদায় করলেন তিনি দীন পালন করলেন।

কিন্তু সালাত আদায় করার জন্যে আল্লাহ্ তায়ালা আল কুরআনে এবং তাঁর রসূলের মাধ্যমে কিছু বিধি নিষেধ, নিয়ম পদ্ধতি এবং সময় ও সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যেমন- সময় হওয়া, সময়ের সীমারেখা অতিক্রম না করা, পবিত্র হওয়া, অযু করা, কেবলামুখি হওয়া, কুরআন পাঠ করা, রুকু করা, সাজদা করা, দাঁড়ানো, বসা, বিভিন্ন তসবিহ ও দোয়া পাঠ করা, সালামের মাধ্যমে নামায শেষ করা। তাছাড়া সালাতের মধ্যে অন্য কোনো কাজ না করা, কথাবার্তা না বলা, এদিক সেদিক না তাকানো, ধারাবাহিকতা লংঘন না করা, অযু ভঙ্গ না করা। -এ জিনিসগুলো অর্থাৎ এসব বিধিবিধান, নিয়মকানুন, করণীয়, বর্জনীয়, সময়, সীমারেখা ও ধারবাহিকতা পালন করাটাই শরিয়া।

দীন যেমন নবীর মাধ্যমে আল্লাহ্ প্রদত্ত, একইভাবে শরিয়াও নবীর মাধ্যমে আল্লাহ প্রদত্ত। দীন এবং শরিয়ার পূর্ণ রূপই হলো ইসলাম।

কুরআন বলছে, সকল নবীকে একই শাশ্বত দীন প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু নবীদের ভিন্ন ভিন্ন শরিয়া প্রদান করা হয়েছে:

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ۖ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ•

১. Abul A'la Maudoodi : Towards Understanding Islam.

অর্থ: তিনি তোমাদের জন্যে বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন সেই দীন যার নির্দেশ দিয়েছিলেন ইবরাহিম, মুসা এবং ঈসাকে। তিনি সবাইকে নির্দেশ দিয়েছেন: তোমরা এই দীন প্রতিষ্ঠিত করো এবং তাতে ফেরকা সৃষ্টি করোনা। (সূরা ৪২ আশ শূরা: আয়াত ১৩)

মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.-এর মাধ্যমে অতীতের নবীগণকে প্রদত্ত সকল শরিয়া রহিত করে মহান আল্লাহ সকল মানুষের জন্যে একটি মাত্র শরিয়া প্রদান করেছেন। সেটাই হলো 'ইসলামি শরিয়া'। আল কুরআন পরিষ্কার করে বলছে:

لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ •

অর্থ: আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্যে একটি ইবাদত-পদ্ধতি (শরিয়া) দিয়েছিলাম, তারা সেটার অনুসরণ করতো। (সূরা ২২ আল হজ্জ: আয়াত ৬৭)

অতপর দীনের অনুসরণের জন্যে মহান আল্লাহ তাঁর শেষ নবী মুহাম্মদ সা.-কে একটি পৃথক শরিয়া প্রদান করেন। তিনি বলেন:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ •

অর্থ: অতপর (হে মুহাম্মদ!) আমি তোমাকে অনুশাসন (commandment)-এর একটি বিশেষ শরিয়ার (পন্থা পদ্ধতির) উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। সুতরাং তুমি এরই অনুসরণ করো এবং যারা জানেনা, তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করোনা। (সূরা ৪৫: আল জাসিয়া: আয়াত ১৮)

### ০৩. শরিয়া প্রণেতা কে?

ইসলামি শরিয়া মূলত আল্লাহ প্রদত্ত। আর যেহেতু আল্লাহ তায়ালা দীন ও শরিয়া নাযিল করেছেন আখেরি নবী মুহাম্মদ রসূলুল্লাহর প্রতি, তাই তিনি তাঁকে দীন ও শরিয়ার ব্যাখ্যাতা এবং মানুষের মাঝে ফায়সালাকারীও নিযুক্ত করেছেন। এভাবে তিনি রসূল সা.-কেও শরিয়া প্রণয়নের এখতিয়ার দিয়েছেন। তাই তিনি শরিয়ার যে ব্যাখ্যাই প্রদান করেছেন এবং যে ফায়সালাই দিয়েছেন তা মূলত আল্লাহর নির্দেশনা মাফিকই দিয়েছেন:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ

অর্থ: আল্লাহ এবং তাঁর রসূল যখন কোনো বিষয়ে নির্দেশ/ফায়সালা (decree) প্রদান করেন, তখন কোনো মুমিন পুরুষ বা নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার নেই। (সূরা ৩৩ আহযাব: আয়াত ৩৬)

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

অর্থ: না, তোমার প্রভুর শপথ! তারা ততোক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হবেনা, যতোক্ষণ না তারা নিজেদের বিবাদ ও সমস্যাসমূহের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ করে; অতপর তোমার ফায়সালা সম্পর্কে তাদের মনে কোনো দ্বিধা না থাকে এবং নিশ্চিন্ত মনে তা মেনে নেয়। (সূরা ৪ আন নিসা: ৬৫)

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ • إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ •

অর্থ: তিনি (মুহাম্মদ) নিজের খুশিমতো কথা বলেন না। তিনি যা বলেন, তা হলো অহি, যা তার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়। (সূরা ৫৩ আন নজম: আয়াত ৩-৪)

### ০৪. শরিয়ার উৎস কি?

দীন যেমন রসূলের মাধ্যমে আল্লাহ প্রদত্ত, তেমনি শরিয়াও রসূলের মাধ্যমে আল্লাহ প্রদত্ত। সুতরাং ইসলামি শরিয়ার উৎস মূলত দুটি:

১. আল্লাহর কিতাব আল কুরআন এবং

২. আল্লাহর নবী মুহাম্মদ রসূলুল্লাহর সুন্নাহ।

এ দুটিই ইসলামি শরিয়ার উৎস। ইসলামি শরিয়ার বিধি-বিধান কুরআনেই প্রদান করা হয়েছে। কুরআন শরিয়ার মূলনীতি দিয়েছে এবং বিধি-বিধান দিয়েছে কোথাও সংক্ষেপে, কোথাও বিস্তারিতভাবে। কুরআন প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করা এবং কুরআনের ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে রসূলের উপর। সুতরাং রসূলের সুন্নাহও ইসলামি শরিয়ার উৎস। আল্লাহ বলেন:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا

অর্থ: রসূল তোমাদের যা প্রদান করে তা গ্রহণ করো, আর যা কিছু নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাকো এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করো। (সূরা ৫৯ হাশর: আয়াত ৭)

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

অর্থ: তোমাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে যদি মতবিরোধ সৃষ্টি হয়, তবে তা (মীমাংসার জন্যে) রুজু (refer) করো আল্লাহ এবং রসূলের নিকট। (সূরা ৪ আন নিসা: আয়াত ৫৯)

রসূল সা. বিদায় হজ্জের ভাষণে পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِه

অর্থ: আমি তোমাদের জন্যে দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতোদিন তোমরা এদুটোকে আঁকড়ে ধরে রাখবে, ততোদিন কিছুতেই বিপথগামী হবেনা। সেগুলো হলো: ১. আল্লাহর কিতাব এবং ২. তাঁর রসূলের সুন্নাহ। (মুসনাদে আহমদ, তিরমিযি)

প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আইন প্রণয়নের জন্যে আরেকটি উৎসের ইংগিত পাওয়া যায় আল কুরআন এবং সুন্নাহ থেকে। সেটির নাম ইজতিহাদ। অবশ্য কোনো কোনো উসূলবিদ (আইনের মূলনীতি সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ) ইজতিহাদের স্থলে কিয়াসকে এই তৃতীয় উৎস হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

যারা কিয়াসের কথা উল্লেখ করেছেন, তাঁরা মনে করেন কিয়াস করার জন্যে ইজতিহাদের প্রয়োজন।

আর যারা ইজতিহাদকে এই তৃতীয় উৎস বলেছেন, তাঁরা বলেছেন, মূলত মুজতাহিদই (ইজতিহাদকারী) কিয়াস এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ায় বিধান নির্ণয়, উদ্ভাবন ও প্রণয়ন করেন।

এ বিষয়ে সর্বপ্রথম উসূল (শরিয়ার বিধান নির্ণয়ের মূলনীতি) গ্রন্থ রচনাকারী ইমাম শাফেয়ী বলেন:

كُلُّ مَا نَزَلَ بِمُسْلِمٍ فَفِيْهِ حُكْمٌ لاَزِمٌ وَعَلَيْهِ اِذَا كَانَ بِعَيْنِه اِتِّبَاعَه وَاِذَا لَمْ يَكُنْ فِيْهِ بِعَيْنِه طَلَبَ الدَّلِيْلَ عَلَى سَبِيْلِ الْحَقِّ بِالاِجْتِهَادِ وَالاِجْتِهَادُ هُوَ الْقِيَاسُ •

অর্থ: মুসলিমের জন্যে যা কিছু নাযিল হয়েছে তা অপরিহার্য হুকুম ও বিধান। হুকুম যখন সুস্পষ্ট ও অকাট্য হয় তখন তাকে তা পালন করতে হবে। আর যেসব হুকুম সুস্পষ্ট নয়, ব্যাখ্যা সাপেক্ষ, সেসব ক্ষেত্রে ইজতিহাদের মাধ্যমে সঠিক যুক্তি প্রমাণ অনুসন্ধান করতে হবে আর ইজতিহাদই কিয়াস।[২]

প্রকৃতপক্ষে এই তৃতীয় উৎসটি ইজতিহাদই। আর ইজতিহাদ দ্বারা প্রণীত আইন বা বিধান অবশ্যি কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে। কুরআন সুন্নাহ্‌র সাথে সাংঘর্ষিক হলে তা বাতিল। অর্থাৎ এটি শর্ত সাপেক্ষ উৎস।

২. ইমাম শাফেয়ী : আর রিসালাহ্

এ প্রসঙ্গে সারকথা হলো, কুরআন এবং সুন্নাহ্ই ইসলামি শরিয়ার মূল উৎস। ইজতিহাদি মত কুরআন সুন্নাহ দ্বারা অনুমোদিত হলেই কেবল আইনের মর্যাদা লাভ করবে।

ইজতিহাদ এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে সম্মুখে আলোচনা আসছে।

### ০৫. আল কুরআন

শরিয়ার মূল এবং প্রথম উৎস আল কুরআন। এটি আল্লাহর কিতাব। আরবি ভাষায় অবতীর্ণ। এটির ভাষা এবং বক্তব্য দুটোই আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত। এ কিতাব অক্ষরে অক্ষরে সুসংরক্ষিত। এতে সন্দেহের অবকাশমাত্র নেই। এ মহাগ্রন্থ আল্লাহর নির্ভুল কিতাব, এর ভাষা নির্ভুল, এর বিধান নির্ভুল, এর উদ্দেশ্য মানবতার মুক্তি ও কল্যাণ, এর উপযোগীতা সার্বজনীন, এর সত্যতা সকল চ্যালেঞ্জের উর্ধে, এর কার্যকারিতা চিরন্তন শাশ্বত, এর সুফল অনিবার্য।

এ কিতাব সকল সত্যজ্ঞানের অনাবিল ফল্গুধারা। এর ভাষা, বক্তব্য ও বিধানের অনুরূপ রচনা করতে সর্বকালের সকল মানুষ সম্পূর্ণ অক্ষম অসহায় অপারগ।

এ মহাগ্রন্থের বিপরীতে সত্য, বাস্তবতা ও কল্যাণ অনুপস্থিত। এ মহাগ্রন্থের অস্বীকৃতি ও অপ্রয়োগ মানে অকল্যাণের অনিবার্য উপস্থিতি।

এ কিতাব সবচেয়ে খাঁটি, সঠিক, বাস্তব, নির্ভুল ও সুষম পথ দেখায়:

إِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ اَقْوَمُ

অর্থ: নিশ্চয়ই এ কুরআন সেই পথ দেখায়, যা সবচেয়ে খাঁটি সঠিক ও সুষম। (আল কুরআন সূরা ১৭ ইসরা: আয়াত ০৯)

### ০৬. আস্ সুন্নাহ

সুন্নাহ্ ইসলামি শরিয়ার দ্বিতীয় উৎস। সুন্নাহ্ হলো আল কুরআনের বাহক- যাঁর প্রতি কুরআন নাযিল করা হয়েছে তাঁর অর্থাৎ মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.-এর বাণী, কর্ম ও অনুমোদনের মাধ্যমে প্রদত্ত দীন ও শরিয়ার তত্ত্ব, তথ্য ও বিধি বিধান।

রসূলুল্লাহ সা.-এর সুন্নাহ সংরক্ষিত রয়েছে তাঁর হাদিসের ভান্ডারে। বিশেষ বিবেচনায় ব্যাপক হাদিস সংকলন বিলম্বিত হয় প্রায় শত বৎসর। এ দীর্ঘ সময় সাহাবি, তাবেয়ী এবং তাবে তাবেয়ীগণ হাদিস শিক্ষা, প্রচার ও সংরক্ষণের জন্যে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় নির্ভুলভাবে হাদিস সংরক্ষিত হতে থাকে। পরবর্তীতে ব্যাপক অনুসন্ধানের মাধ্যমে সকল হাদিস লিপিবদ্ধ করে ফেলা হয়।

মৌখিক শিক্ষা ও হেফয্ করণের যুগে হাদিস ভান্ডারে কিছু দুর্বল সূত্রের হাদিস এবং জাল হাদিস ঢুকে পড়ে।

কিছু দরবেশ সুফী সাধক মানুষকে দীনদারীর প্রতি মনোযোগী করার উদ্দেশ্যে নিজেরাই হাদিস রচনা করে রসূলের নামে চালিয়ে দেয়। অপরদিকে ইসলামের ক্ষতি সাধনকারী দুষ্টলোকেরা মনগড়া কথা রচনা করে হাদিসের নামে প্রচার করে ছড়িয়ে দেয়। এ উভয় প্রক্রিয়ায় হাদিস ভান্ডারে জাল হাদিস ঢুকে পড়ে।

আলহামদুলিল্লাহ্, মুহাদ্দিসগণ এসব জাল হাদিস যাচাই বাছাইর জন্যে এক ডজনেরও অধিক শাস্ত্র উদ্ভাবন করেন এবং বিশুদ্ধ হাদিস ভান্ডার থেকে জাল হাদিস সমূহকে চিহ্নিত করে ফেলেন।

এর জন্যে মুহাদ্দিস্ এবং শরিয়া বিশেষজ্ঞগণ মৌলিকভাবে দুটি পন্থা অবলম্বন করেন:

১. বর্ণনাকারীদের জীবনী সংগ্রহ, তাদের চরিত্র যাচাই, তাদের বর্ণনা যাচাই এবং এক্সামিন ও ক্রস এক্সামিনের মাধ্যমে দুর্বল অবিশ্বস্ত ও দুষ্ট বর্ণনাকারীদের চিহ্নিত করণ।
২. দেরায়াত পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে জাল ও দুর্বল হাদিসসমূহ চিহ্নত করা।

দেরায়াত পদ্ধতিতে হাদিস যাচাই বাছাই করা হয় এভাবে যে, বর্ণিত হাদিস-

১. কুরআনের বাহ্যিক অর্থ ও মর্মের সাথে সাংঘর্ষিক হবেনা।
২. কুরআনের কোনো নীতি ও আদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক হবেনা।
৩. সাহাবায়ে কিরামের সামষ্টিক কর্মনীতি ও দৃষ্টিভংগির বিপরীত হবেনা।
৪. বর্ণনাকারীর চাক্ষুস দেখার বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হবেনা।
৫. কোনো মুতাওয়াতির হাদিসের বিপরীত হবেনা।
৬. ঈমানী চেতনার সুস্থ বিবেক বুদ্ধির সাথে সাংঘর্ষিক হবেনা।
৭. বর্ণনা কুসংস্কার মিশ্রিত হবেনা।
৮. বর্ণনায় কল্পনা বিলাসী ভাবধারা থাকবেনা।
৯. তাতে কারো বা কিছুর মর্যাদা বর্ণনায় বাড়াবাড়ি থাকবেনা।
১০. তাতে কারো ব্যাপারে এমন দোষের বর্ণনা থাকবেনা, যা কোনো মানদন্ডে গ্রহণ যোগ্য নয়।
১১. তাতে এমন কোনো ভবিষ্যতবাণী থাকবেনা, যাতে নির্দিষ্ট সন, মাস ও তারিখের উল্লেখ থাকবে।
১২. ভাষারীতি এমন হবেনা- যা তৎকালীন আরবি ভাষার মানদন্ডে উত্তীর্ণ নয়।
১৩. বক্তব্যের অর্থ ও তাৎপর্য নবুয়্যতের মর্যাদার পরিপন্থী হবেনা।[৩]

৩. মুকাদ্দমা ফতহুল মুলহিম।

সুন্নাহ কুরআন নয়, তবে কুরআনের প্রতিবিম্ব। কুরআন হলো মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌র প্রতি অবতীর্ণ ভাষা ও মর্ম সম্বলিত আল্লাহ্‌র প্রত্যক্ষ অহি। আর মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. হলেন বাস্তব কুরআন।

- তিনি কুরআনের ব্যাখ্যাতা। তাঁর ব্যাখ্যাই কুরআনের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা।

- তিনি কুরআনের বিধান বাস্তবায়নকারী। তিনি যে পন্থা প্রক্রিয়া ও নিয়ম পদ্ধতিতে বিধান বা কুরআনের হুকুম আহকাম বাস্তবায়ন করেছেন, সেটাই তা বাস্তবায়নের চূড়ান্ত পদ্ধতি।

- তাছাড়া কুরআনে উল্লেখ নেই এমন অনেক বিষয়েই তাঁকে দিক নির্দেশনা দিতে হয়েছে, ফায়সালা দিতে হয়েছে, নিয়ম বিধান দিতে হয়েছে। সেগুলোও তিনি আল্লাহ্‌র ইশারার ভিত্তিতেই করেছেন, অথবা সেগুলো আল্লাহ কর্তৃক অনুমোদিত।

এসবই তাঁর সুন্নাহ। আল্লাহ তাঁর প্রতি যে জীবন বিধান নাযিল করেছেন, এসবই তার ব্যাখ্যা বা বাস্তব রূপ। আল কুরআন তথা আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধানের একমাত্র অনুমোদিত ব্যাখ্যাতা তিনিই:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

অর্থ: আর আমরা তোমার প্রতি আয যিক্‌র (আল কুরআন) নাযিল করেছি, যাত করে তুমি মানুষকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দাও- যা তাদের জন্যে নাযিল করা হয়েছে। (সূরা ১৬ আন নহল: আয়াত ৪৪)

সুন্নাহ ছাড়া ইসলাম পালন করাই অসম্ভব। যেমন: কুরআন মজিদে নামায পড়তে বা কায়েম করতে বলা হয়েছে। নামাযের সময়ের ব্যাখ্যাসাপেক্ষ নির্দেশনাও দেয়া হয়েছে এবং রুকু ও সাজদা করতে বলা হয়েছে। কিন্তু এতোটুকুতেই নামায আদায় করা সম্ভব নয়। নামাযের ওয়াক্তের শুরু এবং শেষ, তকবির বলে শুরু করা, প্রতি রাকাতে সূরা ফাতেহা পাঠ করা, একটি রুকু করা, দুইটি সাজদা করা, ফজর নামায দুই রাকাত পড়া, যুহর চার রাকাত, আছর চার রাকাত, মাগরিব তিন রাকাত এবং এশা চার রাকাত পড়া, আত্তাহিয়্যাতু পড়া, দরুদ পড়া, সালাম বলে নামায শেষ করা- এসবই জানা যায় সুন্নাহ থেকে। এগুলো কুরআনে উল্লেখ করা হয়নি।

এভাবে সকল বিষয়েই মৌলিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে কুরআনে এবং ব্যাখ্যা ও বিস্তারিত রূপ দেয়া হয়েছে সুন্নায়। সুতরাং সুন্নাহ ছাড়া দীন ও শরিয়া পালন করা সম্ভব নয়। সুন্নাহ্‌ কুরআনেরই ব্যাখ্যা এবং বাস্তব রূপ।

আল কুরআনের উল্লেখিত অকাট্য আয়াতসমূহ থেকে পরিষ্কার হয়ে গেলো, ইসলামি শরিয়া তথা ইসলামি আইন ও বিধানের উৎস হলো আল্লাহর কিতাব আল কুরআন এবং তাঁর রসূল মুহাম্মদ সা.-এর সুন্নাহ।

## ০৭. ইজতিহাদ

ইজতিহাদ আরবি শব্দ এবং ইসলামি শরিয়ার একটি পরিভাষা। اِجْتِهَادٌ শব্দের শব্দমূল হলো جَهْدٌ জাহ্‌দুন বা جُهْدٌ জুহ্‌দুন। এর অর্থ চেষ্টা প্রচেষ্টা চালানো, চূড়ান্ত সাধনা করা, সাধ্যানুযায়ী প্রচেষ্টা চালানো।

উসূলবিগণের পরিভাষায়: 'ইজতিহাদ হলো কুরআন ও সুন্নায় পাওয়া যায়না এমন বিষয়ের শরয়ী বিধান উদ্ভাবনের জন্যে কোনো মুজতাহিদ বা ফকিহ্ কর্তৃক নিষ্ঠার সাথে নিজের সমস্ত জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে সর্বাত্মক চিন্তা গবেষণায় নিয়োজিত করা।'[৪]

কাযী বায়দাবি ইজতিহাদের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে-

هُوَ اِسْتِفْرَاغُ الْجُهْدِ فِى دَرْكِ الاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ

'ইজতিহাদ হলো শরয়ী বিধান জানা ও অবগত হওয়ার জন্যে পূর্ণ প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা।'[৫]

ইমাম মুহাম্মদ আবুয যুহ্‌রা ইজতিহাদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, ফকিহ্‌দের মতে ইজতিহাদ হলো:

اَلاِجْتِهَادُ بَذْلَ الْفَقِيْهِ وُسْعَه فِى اسْتِنْبَاطِ الاَحْكَامِ العَمَلِيُّه مِنْ اَدِلَتِهَا التَّفْصِيْلِيَّة

অর্থ: বিস্তারিত যুক্তি ও প্রমাণসহ বাস্তব কর্ম ও আচরণের বিধান নির্ণয়ে ফকিহ্‌র সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোকে ইজতিহাদ বলা হয়।[৬]

ইমাম আবু যুহ্‌রা আরো বলেন:

اَلاِجْتِهَادُ فِى اِصْطِلاَحِ الاُصُوْلِيِّيْنَ بِأَنَّهُ اِسْتِفْرَاغُ الْجُهْدِ وَبَذْلُ غَايَةِ الْوُسْعِ اِمَّا فِى اِسْتِنْبَاطِ الاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَاِمَّا فِى تَطْبِيْقِهَا •

অর্থ: উসূলবিদদের দৃষ্টিতে ইজতিহাদ হলো: শরিয়তের বিধান নির্ণয় করা, কিংবা বিরোধের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য বিধান করার কাজে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা ও সর্বাত্মক সাধনায় আত্মনিয়োগ করা।[৭]

আবুল আ'লা মওদূদীর মতে ; ইজতিহাদের আভিধানিক অর্থ হলো কোনো কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্যে সাধ্যমতো চেষ্টা করা। আর পারিভাষিক অর্থ

৪. আল্লামা আমদি : আহকামুল আহকাম ৪র্থ খন্ড
৫. কাযী বায়দাবি : মিনহাজুল উসূল
৬. ইমাম মুহাম্মদ আবুয যুহ্‌রা : উসূল আল ফিক্‌হ)
৭. ইমাম মুহাম্মদ আবুয যুহ্‌রা : উসূল আল ফিক্‌হ

হলো: কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে ইসলামের বিধান বা উদ্দেশ্য জানার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা সাধনা করা।[৮]

যিনি যোগ্যতার অধিকারী হয়ে ইজতিহাদ করেন, তাকে মুজতাহিদ বলা হয়।

ইসলাম একটি জীবন্ত গতিশীল জীবন-বিধান। মানুষের জীবন যাপন এবং জীবনের মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে এ বিধানে কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা কিংবা স্থবিরতা নেই। কারণ, ইসলাম হলো মানুষের গ্রষ্টার প্রদত্ত বিধান। এ বিধান সর্বযুগে সর্বাধুনিক হবার কারণ হলো: 'সৃষ্টি যার বিধান তার'। এ বিধান সম্পর্কে কুরআন বলে দিয়েছে:

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

অর্থ: জেনে রাখো, সৃষ্টি তাঁরই এবং নির্দেশও তাঁরই। আল্লাহ মহাজগতের মহা কল্যাণময় প্রভু। (সূরা ৭ আল আ'রাফ: আয়াত ৫৪)

আল্লাহ প্রদত্ত শরিয়ার একটি প্রশস্ত ও কল্যাণময় দিক হলো, মানব জীবনে যখনই কোনো নতুন বিষয় দেখা দেয় এবং নতুন কোনো সমস্যার উদ্ভব ঘটে, সে বিষয়ে কুরআন এবং সুন্নায় যদি কোনো বিধান বা দিক নির্দেশনা পাওয়া না যায়, তখন সেক্ষেত্রে কুরআন সুন্নাহ্র মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ (এবং সাংঘর্ষিক নয়) এবং মানুষের জন্যে কল্যাণকর (ক্ষতিকর নয়) কোনো প্রচলিত মত বা গবেষণালব্ধ মত, কিংবা বিজ্ঞজনদের সমর্থিত মত বা প্রথা, বা দৃষ্টান্ত অথবা কল্যাণকর কোনো নিয়ম-রীতি গ্রহণ করার অবকাশ ইসলামি শরিয়া প্রদান করেছে।

ইসলামি ফিক্হের মূলনীতি অনুযায়ী ইজতিহাদের মাধ্যমে উপরোল্লেখিত বিভিন্ন পন্থায় যেসব বিধি নির্ণয় করা হবে সেগুলো শর্তসাপেক্ষে 'শরিয়া বিধি' হিসেবে গ্রহণযোগ্য।

এ ধরণের মত, গবেষণালব্ধ মত, ঐক্যমত, দৃষ্টান্ত, প্রথা, প্রচলন শরিয়া আইনে গ্রহণযোগ্য হবার জন্যে দুইটি মৌলিক শর্ত পূরণ হওয়া অপরিহার্য:

১. যেসব ক্ষেত্রে কুরআন সুন্নায় বিধি বর্তমান নেই, কেবল সেসব ক্ষেত্রে এগুলো প্রযোজ্য হবে।
২. কুরআন সুন্নায় বিধৃত কোনো বিধি এবং কুরআন সুন্নাহ্র স্পীরিটের সাথেও সাংঘর্ষিক হতে পারবেনা।

এছাড়া সাহাবায়ে কিরামের ইজমা এবং মতামতের সাথেও সাংঘর্ষিক হতে পারবেনা।

ইজতিহাদের মাধ্যমে প্রাপ্ত এ ধরণের কোনো মত বা রীতিনীতির বিষয়ে যদি কুরআন বা সুন্নায় কোনো ফায়সালা না থাকে এবং এসব

৮. আবুল আ'লা মওদূদী : তাফহিমাত ৩য় খন্ড

মত বা দৃষ্টান্ত, বা রীতিনীতি যদি কুরআন সুন্নাহ্‌র সাথে সাংঘর্ষিক না হয়, তবে এগুলোর মর্যাদা হলো, এগুলো শরিয়া অনুমোদিত ও সমর্থিত বিধান বলে গণ্য হবে।

তবে এগুলোর ক্ষেত্রে মতভেদ দোষনীয় নয়। উত্তম ও কল্যাণকর মতই গ্রহণযোগ্য।

### ০৮. ইজতিহাদের নির্দেশনা ও সূচনা

আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজিদেই রসূল সা.-কে ইজতিহাদ করার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন এবং তিনি সাহাবায়ে কিরামকে ইজতিহাদ করার দায়িত্ব অর্পন করেছেন। রসূল সা. নিজে ইজতিহাদ করেছেন এবং সাহাবায়ে কিরামকে ইজতিহাদ করতে উৎসাহিত করেছেন। রসূলুল্লাহ সা.-এর ইজতিহাদ আল্লাহ তায়ালা অনুমোদন প্রদান করতেন। কখনো তাঁর কোনো ইজতিহাদি ভুল হলে আল্লাহ তায়ালা সাথে সাথে তা সংশোধন করে দিতেন।

আল কুরআন জ্ঞানী লোকদের ইজতিহাদের অনুমতি দিয়েছে। নিম্নোক্ত আয়াতগুলো তার দলিল:

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

অর্থ: সুতরাং তোমরা না জানলে (কিতাবের) জ্ঞানধারীদের জিজ্ঞাসা করো। (সূরা ১৬ আন নহল: আয়াত ৪৩, সূরা ২১ আল আম্বিয়া: আয়াত ৭)

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ

অর্থ: তারা যদি বিষয়টি আল্লাহ্‌র রসূলের এবং তাদের দায়িত্বশীলদের গোচরে নিতো, তবে তাদের মধ্যে যারা তথ্যানুসন্ধান করে, তারা তার যথার্থতা নির্ণয় করতে পারতো। (সূরা ৪ আন নিসা: আয়াত ৮৩)

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ অর্থ: তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে। (সূরা ৪২ আশ্ শূরা: আয়াত ৩৮)

আয়াতগুলো জ্ঞানী ও দায়িত্বশীলদের ইজতিহাদ করার অনুমতি প্রদান করে।

রসূলুল্লাহ সা.-এর সুন্নাহ থেকেও জ্ঞানী ও দায়িত্বশীল লোকদের ইজতিহাদ করার অনুমতি ও উৎসাহ পাওয়া যায়। কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করা হলো:

১. রসূলুল্লাহ সা. মুয়ায রা. কে ইয়েমেনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠাবার কালে তার কাছে জানতে চইলেন: ‘ কোনো বিষয় (ফায়সালার জন্যে) তোমার কাছে উপস্থাপন করা হলে তুমি কী করবে?’ মুয়ায বললেন: ‘আমি তা ফায়সালা করবো আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী।’ রসূল

জিজ্ঞেস করলেন: 'তুমি যদি আল্লাহ্‌র কিতাবে কোনো সমাধান না পাও সেক্ষেত্রে কী করবে?' মুয়ায বললেন: 'তখন আমি আল্লাহ্‌র রসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী ফায়সালা করবো।' রসূলুল্লাহ সা. জানতে চাইলেন: 'রসূলের সুন্নাহতেও যদি কোনো সমাধান না পাও, সেক্ষেত্রে কী করবে?' মুয়ায বললেন: ' সেক্ষেত্রে আমি নিজেই ইজতিহাদ করে ফায়সালা করবো।' তখন রসূলুল্লাহ সা. মুয়াযের বুক চাপড়ে দিয়ে বললেন: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি তাঁর রসূলের দূতকে/ প্রতিনিধিকে এমন হিদায়াত দান করেছেন যা তাঁকে এবং তাঁর রসূলকে সন্তুষ্ট করেছে।' (সুনানে আবু দাউদ: বিচার ফায়সালা অধ্যায়)

২. সহীহ বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, খন্দক অর্থাৎ আহযাবের যুদ্ধ শেষে প্রত্যাবর্তনকালে রসূলুল্লাহ সা. সাহাবীদের নির্দেশ দিলেন (মদিনা সনদ লংঘনকারী) ইহুদি গোষ্ঠী বনি কুরাইযার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার। পথিমধ্যেই তিনি সাহাবীদের বনি কুরাইযার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করতে বললেন। তিনি বললেন: 'তোমরা বনি কুরাইযায় পৌঁছার আগে আসর নামায পড়বেনা।' সাহাবীগণ রওয়ানা করলেন। পথিমধ্যে আস্‌র নামাযের সময় উপস্থিত হলো একদল সাহাবী বললেন: 'আমরা এখানেই আস্‌র নামায পড়বো'। আরকেদল সাহাবী বললেন: 'নামাযের সময় চলে গেলেও রসূলুল্লাহ সা.-এর নির্দেশমতো আমরা বনি কুরাইযায় না পৌঁছে আস্‌র নামায পড়বোনা।' সুতরাং একদল সাহাবী সময়মতো পথিমধ্যে আস্‌র নামায পড়ে নিলেন এবং আরেকদল সাহাবী নামাযের সময় পার হয়ে যাওয়ার পর বনি কুরাইযায় গিয়ে আস্‌র নামায পড়লেন। অতপর রসূলুল্লাহ সা. ওখানে পৌঁছুলে উভয় পক্ষ (নিজেদের যুক্তি সহ) তাঁকে ঘটনার বিবরণ দিলেন। রসূলুল্লাহ সা. উভয় পক্ষের যুক্তি ও পন্থাকে সমর্থন করেন। তিনি কোনো পক্ষকে ভর্ৎসনা করেননি।

৩. সহীহ বুখারি ও মুসলিমে আম্মার রা. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি (খলিফা) উমর বিন খাত্তাব রা.-এর কাছে এসে বললো: আমার উপর গোসল ফরয হয়েছে, কিন্তু পানি পাচ্ছিনা, এখন আমি কী করবো (কিভাবে নামায পড়বো)? আম্মার তখন উমর রা.-কে বললেন: আপনার কি মনে নেই, আপনি এবং আমি এক সফরে ছিলাম এবং (স্বপ্নদোষের কারণে) উভয়ে অপবিত্র হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু আপনি পানি না পেয়ে তখন নামায পড়লেন না, কিন্তু আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে নামায পড়লাম। অতপর আমরা রসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে ঘটনাটির বিবরণ দিলে তিনি আমাকে বলেছিলেন: তোমার জন্যে এতোটুকু করাই যথেষ্ট ছিলো- একথা বলে তিনি নিজের দুই হাতের তালু জমিনে মারলেন, তারপর হাত উঠিয়ে ফু দিলেন এবং উভয় হাতের তালু দিয়ে নিজের মুখমন্ডল এবং দুই হাত কনুই পর্যন্ত মাসেহ্ করলেন অর্থাৎ তায়াম্মুম করলেন।

এসব উদ্ধৃতি ও দৃষ্টান্ত থেকে কতিপয় বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেলো। আমরা জানতে পারলাম:

১. কুরআন মজিদে ইজতিহাদের বিষয়ে সুস্পষ্ট ইংগিত রয়েছে।
২. উদ্ধৃত প্রথম হাদিস থেকে জানা গেলো আল কুরআন এবং সুন্নায় ফায়সালা পাওয়া না গেলে ইজতিহাদ করার মধ্যেই আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের সন্তুষ্টি রয়েছে। ইজতিহাদের ইচ্ছা প্রকাশ করায় রসূলুল্লাহ সা. মুয়াযকে উৎসাহিত ও অভিনন্দিত করেছেন।
৩. উদ্ধৃত দ্বিতীয় হাদিসটি হলো বনি কুরাইযায় গিয়ে নামায পড়া সংক্রান্ত। এখানে বনি কুরাইযায় না পৌছে আস্‌র নামায না পড়ার নির্দেশ ছিলো। কিন্তু এই নির্দেশ বাস্তবায়নে সাহাবীগণ দুই রকম আমল করেছেন।

   একদল সাহাবী রসূলুল্লাহ সা.-এর আদেশ বাহ্যিক অর্থের ভিত্তিতে হুবহু পালন করেন এবং আস্‌র নামাযের সময় চলে যাওয়া সত্ত্বেও বনি কুরাইযায় না পৌঁছে পথে নামায পড়েননি।
৪. সাহাবীগণের অপর দল রসূল সা.-এর নির্দেশের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ না করে নির্দেশের উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করেন। ফলে তাঁরা মনে করেন: 'রসূলুল্লাহ সা.-এর উদ্দেশ্য ছিলো বনু কুরাইযায় পৌঁছা তরান্বিত করা এবং অকারণে পথে বিলম্ব না করা। নামাযের সময় চলে গেলেও পথে নামায পড়া যাবেনা- এমনটি আল্লাহ্‌র রসূলের উদ্দেশ্য ছিলোনা।' এই ইজতিহাদের ফলে তাঁরা পথেই সময়মতো নামায পড়ে নেন।
৫. সাহাবীগণের প্রথম গ্রুপের কর্মপন্থা ছিলো সুন্নাহ্‌র বাহ্যিক অর্থ ভিত্তিক।
৬. দ্বিতীয় গ্রুপের কর্মপন্থা ছিলো ইজতিহাদের মাধ্যমে নির্দেশের উদ্দেশ্য নির্ণয় করে সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ ভিত্তিক।
৭. সাহাবীগণের উভয় গ্রুপই নিজেদের কর্মপন্থা অনুমোদনের জন্যে রসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট পেশ করেন। তাঁরা একদল আরেকদলকে দোষারোপ করেননি।
৮. রসূলুল্লাহ সা. উভয় কর্মপন্থাই অনুমোদন করেন।
৯. তৃতীয় হাদিসটি আম্মার রা.-এর হাদিস। জুনুবি (অর্থাৎ বীর্যপাতের কারণে গোসল ফরয হওয়া) ব্যক্তি যদি পানি না পায় এবং নামাযের সময় চলে যাওয়ার উপক্রম হয়, সে সময় করণীয় সংক্রান্ত এ হাদিস থেকে জানা গেলো: ঐ সময় পর্যন্ত কুরআন সুন্নায় এ সংক্রান্ত বিধান দেয়া হয়নি। তাই উমর এবং আম্মার দুটি কর্মপন্থা গ্রহণ করেন।
১০. উমর মনে করেন পানি ছাড়া পবিত্র হওয়া যাবে না। আর পবিত্রতা ছাড়া তো নামায পড়া যায়না। তাই তিনি সময়মতো না পড়ে পরে কাযা করেন।
১১. আম্মার ইজতিহাদ করেন। ইজতিহাদের ভিত্তিতে তিনি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে নামায পড়ে নেন।

১২. তারা দুজনে নিজ নিজ কর্মপন্থা রসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট উত্থাপন করেন।
১৩. রসূলুল্লাহ সা. আম্মারের ইজতিহাদি কর্মপন্থা গ্রহণ করেন এবং তা কিছুটা সংশোধন করে আরো সহজ করে দেন।

এরকম ঘটনা সম্বলিত হাদিস আরো রয়েছে।

এভাবে স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগেই ইজতিহাদের সূচনা হয়। তিনি ইজতিহাদকে উৎসাহিত করেন এবং সাহাবীগণের ইজতিহাদ অনুমোদন করেন।

ইমাম জাস্‌সাস্‌ ইজতিহাদ এবং কিয়সের পক্ষে প্রমাণ হিসাবে কুরআন মজিদের বাইশটি আয়াত এবং রসূলুল্লাহ সা.-এর ঊনচল্লিশটি হাদিস উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, এ বিষয়ে সাহাবগণের ইজমা হয়েছে। [৯]

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

অর্থ: আর আমরা তোমার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছি, যাতে প্রতিটি বিষয়ের বয়ান বা নির্দেশনা রয়েছে। (সূরা ১৬ আন নহল: আয়াত ৮৯)

এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম জাস্‌সাস (মৃত্যু ৩৭০হি.) বলেন: সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস, ইজতিহাদ ও ইসতিহসান-এর মাধ্যমে যেসব বিধি বিধান নির্ধারিত হয় সেগুলোও মূলত কুরআনেরই বয়ান। কারণ সেগুলো বিধান হিসেবে কুরআন দ্বারা অনুমোদিত।[১০]

এ প্রসঙ্গে ইমাম শাফেয়ী (মৃত্যু ২০৪হি.) বলেছেন: আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাবে নিজ বান্দাদের জন্যে চার পদ্ধতিতে বিধান দিয়েছেন:

১. কিছু বিধান কুরআন মজিদেই তিনি স্ববিস্তারে বলে দিয়েছেন। যেমন: কেরান হজ্জ পালনকারী যদি কুরবানির পশু সংগ্রহ করতে না পারে, সেক্ষেত্রে স্ববিস্তারে বলে দেয়া হয়েছে তাকে হজ্জের দিনগুলোতে তিনটি এবং হজ্জ থেকে ফেরার পর সাতটি রোযা রাখতে হবে।

২. কিছু বিধান রসূলুল্লাহ সা.-এর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। এগুলো কুরআনের ব্যাখ্যামূলক। যেমন: অযু, গোসল, নামায, রোযা, যাকাত, উশর, হজ্জ, উমরা, বিয়ে তালাক, অসিয়ত, মিরাস, ব্যবসা বানিজ্য, ইজারা, কৃষি, দন্ড, কিসাস, অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদির বিধান।

৩. এমন কিছু বিধান রসূলের মাধ্যমে কার্যকর করিয়েছেন, কুরআনে যেগুলোর উল্লেখ হয়নি। যেমন: রজম।

৪. আর কিছু কিছু বিধান উদ্ভাবনে মুজতাহিদদের জন্যে ইজতিহাদ জরুরি করেছেন। যেমন: ইহরাম অবস্থায় যদি কেউ কোনো প্রাণী হত্যা করে

---

৯. ইমাম জাসসাস : আল ফুসূল ফিল উসূল, মাকতাবায়ে ইলমিয়া লাহোর, পৃ: ৬৪-১০৯।
১০. ইমাম জাস্‌সাস্‌ : আহকামুল কুরআন, ৩য় খন্ড, পৃ. ১৮৯-১৯০।

তবে, তার বিনিময় (ফিদিয়া) প্রদান আবশ্যক। কিন্তু সেটার পরিমাণ কি-তা কুরআন এবং সুন্নায় উল্লেখ করা হয়নি। এ ক্ষেত্রে ইজতিহাদ জরুরি।[১১]

## ০৯. পূর্ণাঙ্গ ও অপূর্ণাঙ্গ মুজতাহিদ

কোনো মুজতাহিদকে দুনিয়ার সকল বিষয়ে ইজতিহাদের যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে এবং পূর্ণাঙ্গ মুজতাহিদ হতে হবে- এটা শর্ত নয়। ইমাম গাযযালি (মৃত্যু ৫০৫হি.), ইবনে কুদামা (মৃত্যু ৬২০ হি.), ইবনে তাইমিয়া (মৃত্যু ৭২৮ হি.), আবু ইসহাক শাতেবী (মৃত্যু ৭৯০ হি.), ইবনুল হুমাম (মৃত্যু ৮৬১ হি.) এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন ইজতিহাদ কোনে পূর্ণাঙ্গ ও অখণ্ড বিষয় নয়। যে কেউ আংশিক এবং খণ্ডিত বিষয়ে ইজতিহাদ করতে পারেন।

কেউ একটি বা দুটি বিষয়ে পারদর্শী হতে পারেন এবং সে বিষয়ে ইজতিহাদ করতে পারেন। একই ব্যক্তিকে সকল ক্ষেত্রে (field-এ) ইজতিহাদের যোগ্যতার অধিকারী হওয়া জরুরি নয়। এ প্রসঙ্গে ইমাম গাযযালি বলেন: "স্বাধীন স্বয়ং সম্পূর্ণ মুজতাহিদ হবার জন্যে আটটি শর্ত উল্লেখ করেছি। এ শর্তগুলো সেই ব্যক্তির জন্যে যিনি সকল বিষয়ে ফাতওয়া (ফায়সালা বা মতামত) দেবেন। আমার মতে ইজতিহাদ এমন কোনো পদবির নাম নয় যে, তা আংশিক বা খন্ডিত হতে পারবে না। কোনো ব্যক্তি একটি বিষয়ে পারদর্শী হতে পারেন, অপর কেউ অন্য বিষয়ে পারদর্শী হতে পারেন।"[১২]

ইবনে কুদামা (রহ.) বলেন: "কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে ইজতিহাদ করার জন্য সকল বিষয়ে ইজতিহাদের যোগ্যতার অধিকারী হওয়া জরুরি নয়। বরং কোনো ব্যক্তি যখন কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে দলিল প্রমাণ ও যুক্তি উপস্থাপনের পদ্ধতি অবগত হয়ে সে বিষয়ের সঠিক মর্ম উপলব্ধিতে সক্ষম হবেন, তখন তিনি সে বিষয়ে মুজতাহিদ। অন্যান্য বিষয়ে তার মধ্যে ইজতিহাদের যোগ্যতা অনুপস্থিত থাকলেও কিছু যায় আসে না।"[১৩]

ইবনে তাইমিয়া (রহ) বলেন: "কখনো কখনো এক ব্যক্তি একটি বিশেষ মাসআলায় বা বিশেষ বিষয়ে ইজতিহাদি জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী হয়ে থাকেন। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে তার পারদর্শীতা নাও থাকতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তি ইজতিহাদ করেন তার জ্ঞান ও বিজ্ঞতার ভিত্তিতে।"[১৪]

সুতরাং মুজতাহিদ পূর্ণাঙ্গও হতে পারেন, অপুর্ণাঙ্গও হতে পারেন, আবার কেবল একটি বিষয়েরও হতে পারেন।

---

১১. ইমাম শাফেয়ী : আর রিসালাহ্।
১২. ইমাম গাযগালি : আল মুস্তাফা, ২য় খন্ড
১৩. ইবনে কুদামা : রওদাতুন নাযের ওয়া জান্নাতুল মানাযের
১৪. শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া : ফতওয়ায়ে ইবনে তাইমিয়া

## ১০. ইজতিহাদের প্রয়োগক্ষেত্র সমূহ

ইজতিহাদ কী উদ্দেশ্যে, কিভাবে, কোন্ ক্ষেত্রে, কি প্রক্রিয়ায় করা হবে, সেসব বিষয়ে উসূলবিদগণ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। মূলত ইজতিহাদের ক্ষেত্র ও কার্যাবলি হলো:

**১. ইস্তিম্বাত:** কোনো বিষয়কে যুক্তি প্রমাণ ও দৃষ্টান্তের সাথে যুক্ত করে কারণ উদ্‌ঘাটনের মাধ্যমে সে বিষয়ের বিধান নির্ণয় করাকে ইস্তিম্বাত বলা হয়।

**২. কিয়াস:** এর আভিধানিক অর্থ হলো: অনুমান করা, পরিমাপ করা, তুলনা করা, সামঞ্জস্য করা। ইমাম গাযযালির মতে: কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে অপর নির্দিষ্ট বিষয়ের সাথে তুলনা করে সামঞ্জস্যপূর্ণ কারণের প্রেক্ষিতে উভয়ের ইতিবাচক বা নেতিবাচক একই বিধান বা ফলাফল সাব্যস্ত করাকে কিয়াস বলা হয়।[১৫]

**৩. আল ইস্তিহ্‌সান:** এর অর্থ- দুটি করণীয়ের মধ্যে অধিকতর কল্যাণকর ও উপকারী কাজটি নির্ণয় ও নির্ধারণ করা। যেমন: মহিলাদের হাত পায়ের তালু (এবং মুখমন্ডল) ছাড়া পুরো শরীরই গোপনীয়। এখন তার গোপনীয় কোনো অংগে এমন রোগ হলো যা চিকিৎসার জন্যে মহিলা ডাক্তার না পাওয়ায় পুরুষ ডাক্তারের দেখা, বা স্পর্শ করা প্রয়োজন। এমতাবস্থায় তার সামনে দুটি পথ রয়েছে: ১. শরিয়তের সাধারণ বিধান অনুযায়ী এবং ফিতনা থেকে বাঁচার জন্যে ডাক্তারকে দেখাবেন না। ২. রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে ডাক্তারকে দেখাবেন। এই দ্বিতীয় পন্থাটি নির্ণয় করাকে ইস্তিহ্‌সান বলা হয়। কারণ এটি কল্যাণকর।

**৪. আল উরফ:** এর মানে প্রচলিত ভালো নিয়ম বা রেওয়াজ। এ ক্ষেত্রে রেওয়াজটিকে প্রত্যাখ্যান করা, বা সংশোধন পূর্বক গ্রহণ করা, বা পুরোপুরি গ্রহণ করার বিষয়ে মত প্রদান করাকে উরফ বলা হয়।

**৫. মাসালিহ্ আর মুরসালা (মাসলাহা):** এর অর্থ বৃহত্তর জনকল্যাণের স্বার্থে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। যেমন: নবীর মসজিদ ভাঙ্গা হয়েছে। তিনি যে মসজিদ তৈরি করে গিয়েছিলেন, পরবর্তীতে জনস্বার্থে তা ভেঙ্গে বড় ও সম্প্রসারিত করা হয়েছে। রসূল সা. কবরকে মসজিদ বানাতে নিষেধ করে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মসজিদ সম্প্রসারণের কারণে তাঁর কবর মসজিদের অভ্যন্তরে পড়ে গিয়েছে। এরূপ অপরিহার্য জনস্বার্থ বিবেচনা করাকে মাসলাহা বলা হয়।

**৬. আয যারায়ে (الذرائع):** এর অর্থ কার্যকারণের প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। অর্থাৎ ইতিবাচক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে নেতিবাচক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না করা। যেমন: রসূল সা. হাদিয়া প্রদান এবং গ্রহণকে

---

১৫. ইমাম গাযযালি : আল মুস্তাফা, ২য় খন্ড

উৎসাহিত করেছেন। কিন্তু যাকাত আদায়কারীদের হাদিয়া গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। কারণ এতে সঠিকভাবে যাকাত আদায়ের উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। যেমন: যুদ্ধ চলাকালে সৈনিকদের উপর অপরাধের দন্ড মওকুফ রাখা হয়েছে। যেমন, মৃত্যুকালে কোনো ব্যক্তি স্ত্রী তালাক দিলে সাহাবীগণ সেই স্ত্রীকে উত্তরাধিকার প্রদান করেছেন। কারণ, এখানে তালাকের উদ্দেশ্য ছিলো উত্তরাধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করা।

**৭. ইস্তিসহাব:** এর অর্থ প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত স্থিতাবস্থার আদেশ দান।

**৮. ফাতওয়া:** এর অর্থ কুরআন সুন্নাহ এবং সাহাবায়ে কিরামের মতামত ও অতীত মুজতাহিদগণের মতামতের ভিত্তিতে মত বা সমাধান প্রদান করা।

**৯. ইসলামি আদালতের কাযীর বা বিচারপতির রায়।**

**১০. ইসলামি মজলিসে শূরা বা পার্লামেন্টের রায়:** শরিয়া বিশেষজ্ঞদের নিয়ে যে শূরা বা পার্লামেন্ট গঠিত হবে, সে পার্লামেন্টের তৈরি আইন।

মূলত এগুলোই হলো ইজতিহাদের ক্ষেত্র।

## ১১. ইজতিহাদ কখন করা হবে?

কুরআন, হাদিস ও শরিয়া বিশেষজ্ঞদের মতে:

১. কোনো বিষয়ে কুরআনে সুস্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া গেলে, সে বিষয়ে অন্য কিছুর প্রতি প্রত্যাবর্তন করা বৈধ নয়।
২. কোনো বিষয়ে কুরআনের বক্তব্যের একাধিক অর্থ গ্রহণের অবকাশ থাকলে সে বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত সুন্নত দ্বারা ফায়সালা করতে হবে।
৩. যে বিষয়ে কুরআন থেকে কোনো ফায়সালা পাওয়া না যাবে, সে বিষয়ে সুন্নাহ থেকে ফায়সালা নিতে হবে।
৪. কোনো বিষয়ে চূড়ান্ত অনুসন্ধান করেও যদি হাদিস পাওয়া না যায়, তবে সে বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামকে অনুসরণ করতে হবে।
৫. কোনো বিষয়ে সাহাবগণ থেকেও যদি কোনো মত বা দৃষ্টান্ত পাওয়া না যায়, কেবল সেক্ষেত্রেই কুরআন ও হাদিসের সাধারণ অর্থ, ভাবগত ইংগিত, উপযোগিতা এবং অতীত মুজতাহিদগণের মতামতের ভিত্তিতে ইজতিহাদের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে।

## ১২. ইজতিহাদের শর্তাবলি

ইমাম নববী তাঁর আল মিনহাজ গ্রন্থে ইসলামি আদালতের বিচারক হবার যোগ্যতা সম্পর্কে লিখেছেন:

০১. তাকে মুসলিম হতে হবে।
০২. বালেগ ও বিবেক সম্পন্ন হতে হবে।
০৩. স্বাধীন হতে হবে।

০৪. পুরুষ হতে হবে।
০৫. ন্যায়পরায়ন হতে হবে।
০৬. শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং বাকশক্তি সম্পন্ন হতে হবে।
০৭. ফায়সালা কার্যকর করার মতো শক্তিমান হতে হবে। সর্বোপরি তাকে মুজতাহিদ হতে হবে। আর মুজতাহিদ ঐ ব্যক্তিই হতে পারেন:
০১. যিনি কিতাব ও সুন্নাহ্‌র বিধান সংক্রান্ত অংশগুলোর উপর গভীর পান্ডিত্যের অধিকারী। তাছাড়া ঐসব বিধানের খাস, আম, মুজমাল, মুবাইয়্যান, নাসিখ ও মানসূখ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখেন।
০২. যিনি বর্ণনাগত দিক থেকে হাদিসসমূহের মুতাওয়াতির, খবরে ওয়াহিদ, মুত্তাসিল ও মুরসাল হবার অবস্থা এবং শক্তিশালী ও দুর্বল রাবি সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন।
০৩. যিনি আরবি ভাষায় পান্ডিত্য রাখেন।
০৪. যিনি সাহাবী ও তাবেয়ী আলিমগণের ব্যাপারে এ খবর রাখেন যে, তাঁরা কোন্ কোন্ মাসআলার ক্ষেত্রে একমত পোষণ করতেন আর কোন্ কোন্ মাসআলার ক্ষেত্রে তাঁদের মতপার্থক্য ছিলো।
০৫. যিনি কিয়াসের তাৎপর্য ও তার সকল প্রকারভেদ সম্পর্কে সম্যক অবগত।

ইমাম গাযযালি তাঁর আল মুস্তাফা গ্রন্থে মুজতাহিদের যোগ্যতা অর্জনের জন্যে আটটি শর্তারোপ করেছেন। সেগুলো হলো:

১. আল কুরআনের যথার্থ জ্ঞান।
২. সুন্নতে রসূলের যথার্থ জ্ঞান।
৩. কুরআন সুন্নাহ্‌র সামগ্রিক বিধান সংক্রান্ত জ্ঞান।
৪. সেসব বিষয়ের যথার্থ জ্ঞান, যেগুলো সম্পর্কে ইজতিহাদ করা জরুরি। (অর্থাৎ যেগুলো সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নায় বিধান পাওয়া যায়না)
৫. ইজতিহাদের মূলনীতি (উসূলে ফিক্‌হ) সংক্রান্ত জ্ঞান।
৬. আরবি ভাষার জ্ঞান, (কেননা সরাসরি কুরআন সুন্নাহ্‌র জ্ঞানার্জনের জন্যে আরবি ভাষা জানা জরুরি)।
৭. নাসেখ ও মানসুখের (রহিত ও রহিতকারী বিধানের) জ্ঞান।
৮. উসূলুল হাদিস-এর জ্ঞান।

ইমাম মুহাম্মদ আবুয যুহরা তাঁর উসূলুল ফিক্‌হ গ্রন্থে বলেছেন, ইজতিহাদের শর্তাবলি নিম্নরূপ:

১. আরবি ভাষার জ্ঞান।
২. আল কুরআনের জ্ঞান।
৩. সুন্নতে রসূলের জ্ঞান।
৪. ইজমা (মতৈক্য) ও ইখতেলাফের (মতভেদের) কারণ জানা।
৫. আহকাম বা বিধানের উদ্দেশ্য জানা।
৬. কিয়াস সংক্রান্ত জ্ঞান।

৭. সুস্থ বিবেক বুদ্ধি।
৮. সুস্থ ও নির্ভুল আকিদা বিশ্বাস।
৯. ইখলাস বা নিয়্যতের নিষ্ঠা।

আবুল আ'লা মওদূদী তাঁর তাফহিমাত ৩য় খন্ডে মুজতাহিদের জন্যে (ইজতিহাদ করার জন্যে) ছয়টি শর্তের উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হলো:

১. আল্লাহ প্রদত্ত দীন ও শরিয়তের প্রতি তার পূর্ণ ঈমান থাকতে হবে। তা অনুসরণে তাকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও নিষ্ঠাবান হতে হবে। শরিয়তের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার কোনো চিন্তা তার মধ্যে থাকতে পারেনা। কুরআন সুন্নাহ ছাড়া অন্য কোনো উৎস থেকে মূলনীতি ও মুল্যবোধ গ্রহণ করা যাবেনা।
২. আরবি ভাষা, ব্যাকরণ ও আরবি সাহিত্যে তার বুৎপত্তি থাকতে হবে।
৩. কুরআন সুন্নাহ্ সম্পর্কে তাকে ব্যাপক বুঝ, জ্ঞান ও পান্ডিত্যের অধিকারী হতে হবে।
৪. উম্মতের পূর্ববর্তী মুজতাহিদগণের যাবতীয় ইজতিহাদ ও অবদান সম্পর্কে তার পূর্ণ ধারণা থাকতে হবে।
৫. নিজের যুগ, কাল এবং সমাজ ও বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে তার বাস্তব ও বিশ্লেষণমূলক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
৬. তাকে ইসলামি নৈতিকতার মানদন্ডে উত্তীর্ণ উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে।

## ১৩. ইজতিহাদি মতের সাথে দ্বিমত করার অধিকার

ইজতিহাদ যেমন যুক্তি, দলিল এবং অন্যান্য যোগ্যতার ভিত্তিতে করা হয়, তেমনি যুক্তি, দলিল ও অন্যান্য যোগ্যতার ভিত্তিতে কোনো ইজতিহাদি মতামতের ব্যাপারে কোনো মুসলিম সিদ্ধান্ত নিতে পারেন:

১. তিনি তা গ্রহণ করতে পারেন।
২. তিনি তা খন্ডণ করতে পারেন।
৩. দ্বিমত পোষন করতে পারেন।
৪. একজনের মতের উপর আরেকজনের মতকে প্রাধান্য দিতে পারেন।
৫. এতোদিন যে মতের উপর আমল করেছেন, তার চাইতে অধিকতর মজবুত ও প্রমাণিত মত পেলে পূর্বেরটি ত্যাগ করে পরেরটি গ্রহণ করতে পারেন।
৬. দুটি সঠিক মত পেলে কঠিনটি ত্যাগ করে সহজটি গ্রহণ করতে পারেন।
৭. যোগ্যতা অর্জন করলে নিজে ইজতিহাদ করতে পারেন।
৮. মজবুত, যুক্তিসংগত, প্রমাণিত ও সহজতর পেলে দশটি ব্যাপারে দশজন ইমাম মুজতাহিদের মত মেনে চলতে পারেন।
৯. নিজের জ্ঞান ও বিচার বিশ্লেষণ ক্ষমতার কমতি বা অভাব থাকলে কোনো একজন মুজতাহিদের তকলিদ (অন্ধ অনুসরণ) করতে পারেন।

## ১৪. ইজতিহাদ আইনের মর্যাদা লাভ করে কিভাবে?

ইজতিহাদের মাধ্যমে বিধান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মুজতাহিদগণের মতের বিভিন্নতা (ইখতিলাফ) সৃষ্টি হতে পারে। এমনটি হওয়া স্বাভাবিক। তবে কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার ইজতিহাদ আইনের মর্যাদা লাভ করার উপায় হলো:

**১. ইজমা:** যদি কোনো ইজতিহাদি মতামতের উপর উম্মতের বিশেষজ্ঞ আলেমগণের ইজমা (ঐক্যমত্য) প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তা আইনের মর্যাদা লাভ করে।

ইজমার সংজ্ঞা: ইমাম শাফেয়ীর মতে, কোনো মত বা মাসআলার ক্ষেত্রে সকল বিশেষজ্ঞ আলেমের একমত হওয়া এবং এর বিপরীত কোনো মত বর্তমান না থাকাকে ইজমা বলা হয়।

ইবনে জারির আত তাবারি এবং আবু বকর আল রাযীর মতে: কোনো মত বা মাসআলার ক্ষেত্রে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ আলেম একমত হলে- তাকে ইজমা বলা হয়।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল যখন কোনো বিষয়ে কোনো মত প্রদান করে বলেন, 'আমাদের জানামতে এ বিষয়ে এর বিপরীত কোনো মত নেই'- তখন ধরে নেয়া হয়, তিনি বলতে চেয়েছেন- উক্ত মতের উপর ইজমা হয়েছে।[১৬]

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মতে কোনো মত বা মাসআলার উপর উম্মতের সমস্ত আলেমের একমত হয়ে যাওয়াকে ইজমা বলা হয়।[১৭]

আল্লামা ইউসুফ আল কারদাভী বলেছেন, প্রকৃত পক্ষে ইজমা সংঘটিত হয়নি।[১৮]

**২. আ'ম মকবুলিয়্যত:** অর্থাৎ সাধারণ গ্রহণযোগ্যতা লাভ করা। কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার ইজতিহাদি মতামত যদি উম্মতের উলামায়ে কিরাম এবং সাধারণ মুসলমানগণ সাধারণভাবে গ্রহণ করে নেয়, তবে তা আইনের মর্যাদা লাভ করে। যেমন: হানাফি, শাফেয়ী, হাম্মলি, যাহেরি, মালেকি, যায়েদি ইত্যাদি ফিক্‌হি মতামত সমূহ বিশ্বের বিভিন্ন এলাকার সর্বশ্রেণীর মুসলিম জনগণ গ্রহণ করে নিয়েছে।

**৩. রাষ্ট্র কর্তৃক আইন হিসাবে গ্রহণ করা হলে:** যেমন ইমাম আবু ইউসুফ প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণ করায় হানাফি ফিক্‌হ রাষ্ট্রীয় আইন হিসেবে চালু হয়ে যায়।

**৪. রাষ্ট্র কর্তৃক দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়ে আইন প্রণয়ন করা হলে:** সরকার যদি কোনো সংস্থাকে কোনো বিষয়ে আইন প্রণয়ন করার দায়িত্ব অর্পন করে

---

১৬. আবুল আ'লা মওদূদী : ইসলামি রাষ্ট্র ও সংবিধান পৃ.৩০৫
১৭. ফাতাওয়ায়ে ইবনে তাইমিয়া ১ম খন্ড
১৮. কারদাভী : শারিয়াতুল ইসলাম : খুলূদুহা ও সিলাহুহা লিত তাতবিক ফি কুল্লে যামান ওয়া মাকান

এবং সে সংস্থা যদি ইজতিহাদের মাধ্যমে আইন প্রণয়ন করে, তখন তা রাষ্ট্রীয়ভাবে আইনে পরিণত হয়।

**৫. আদালতের রায়ঃ** রাষ্ট্রীয় কোর্টের কাযী বা বিচারপতি কোনো ইজতিহাদি মতের ভিত্তিতে যখন কোনো রায় (decree) প্রদান করেন, তখন তা সরকারিভাবে বাস্তবায়ন করা হয়।[১৯]

সকল পর্যায়ের ইজতিহাদের ক্ষেত্রে মুজাতাহিদকে মনে রাখতে হবে শরিয়ার উৎস হচ্ছে আল কুরআন এবং সুন্নাহ। তাই যে কোনো প্রক্রিয়ার ইজতিহাদি আইন অবশ্যি -

১. আইনের উৎস (আল কুরআন ও সুন্নাহ) থেকে গৃহীত হতে হবে, অথবা
২. আইনের উৎস দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে, অথবা
৩. আইনের উৎস কর্তৃক নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থান করে আইন প্রণয়ন করতে হবে।

এই বাধ্যবাধকতা উপেক্ষা করে স্বাধীন ইজতিহাদ করা হলে, তা ইসলামি আইন বলে গণ্য হবেনা।

## ১৫. শরয়ী বিধান সমূহের প্রকারভেদ

উসূলবিদগণ শরিয়ার বিধানসমূহকে কুরআন-সুন্নাহ্‌র মূলনীতির আলোকে বিভিন্ন শ্রেণী এবং স্তরে বিভক্ত করেছেন। হানাফী ফকিহ্‌গণ ব্যতিত বাকী সকল মুজতাহিদগণ বিধান সমূহকে পাঁচভাগে ভাগ করেছেন। তা হলো:

১. ওয়াজিব।
২. মানদূব (নফল)।
৩. হারাম।
৪. মাকরূহ।
৫. মুবাহ্‌।

হানাফীগণ বিধান সমূহকে সাত ভাগে ভাগ করেছেন। তাহলো:

১. ফরয।
২. ওয়াজিব।
৩. মানদূব।
৪. হারাম।
৫. মাকরূহ তাহরিমি।
৬. মাকরূহ তানযিহি।
৭. মুবাহ।

## ১৬. মাকাসিদে শরিয়া (objectives of shariah)

মাকাসিদ শব্দটি বহুবচন। এর একবচন মাকসাদ। মাকসাদ মানে- উদ্দেশ্য

১৯. আবুল আ'লা মওদূদী : তাফহিমাত, ৩য় খন্ড

(objective)। ইসলামের ভিত্তিতে জীবন যাপনের জন্যে আল্লাহ তায়ালা যে নিয়ম-কানুন ও বিধি-বিধান প্রদান করেছেন, তা-ই একমাত্র মানব কল্যাণের শরিয়া। মানুষের ইহ জাগতিক এবং পারলৌকিক সার্বিক কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যেই মহান আল্লাহ শরিয়া প্রদান করেছেন। কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে মাকাসিদে শরিয়া বা ইসলামি শরিয়ার উদ্দেশ্য সমূহ নিম্নরূপ:

০১. ঈমান ও তাওহীদ: অর্থাৎ মুমিনের ঈমান ও আকিদা-বিশ্বাসের সংরক্ষণ।
০২. আদল: ন্যায় বিচার ও সুষমনীতি নিশ্চিত করণ।
০৩. ইহসান ও ফালাহে 'আম: মানবতার কল্যাণ ও সাফল্য নিশ্চিত করণ।
০৪. হায়াতে তাইয়্যেবা: সুন্দর ও স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন নিশ্চিত করণ।
০৫. মানবতার কল্যাণ, সাফল্য এবং সুন্দর-স্বচ্ছন্দ জীবন যাপনের জন্যে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধানের প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ।
০৬. জীবনের নিরাপত্তা বিধান।
০৭. মানব বংশ সংরক্ষণ।
০৮. সম্পদের নিরাপত্তা।
০৯. মর্যাদা তথা মান সম্মান ও ইয্যতের নিরাপত্তা।
১০. মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ও নৈতিক মূল্যবোধের উন্নয়ন ও বিকাশের সুবিধা নিশ্চিত করণ।
১১. চিন্তা, চলাফেরা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করণ।
১২. সামগ্রিক মানবাধিকার সংরক্ষণ।[২০]

## ১৭. ইসলামি শরিয়ার বৈশিষ্ট্য

ইসলামি শরিয়া সর্বদিক থেকে অনন্য। এর অনুপম বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:

**১. মহাবিশ্ব ও মানুষের মহান স্রষ্টা আল্লাহর শরিয়ত:** অর্থাৎ এটি আল্লাহ প্রদত্ত এবং আল্লাহমুখী শরিয়াত।

**২. বিশ্বমানবতাবাদী:** এটি স্থান, কাল, পাত্র, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্যে প্রযোজ্য এবং সকলের উপযোগী।

**৩. সার্বজনীন সুবিচার:** এটি সমগ্র মানব গোষ্ঠীর মধ্যে সমানভাবে আদল, ইনসাফ ও সুবিচার (Justice) প্রতিষ্ঠাকামী।

**৪. ব্যক্তির ও সমষ্টির সমমূল্যায়ন:** শরিয়া আইনের দৃষ্টিতে সকল মানুষের মর্যাদা সমান। এখানে কোনো গোত্র, গোষ্ঠী বা বর্ণের উপর অপর কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী, বর্ণ ও গোত্রের প্রধান্য নেই।

**৫. স্থায়ীত্ব এবং কঠোরতা ও কোমলতার সমন্বয়:** ইসলামি শরিয়া তার আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে যেমন কঠোর, তেমনি আইন প্রয়োগের ব্যাপারে কোমল এবং উদার। ফলে এটি সময়ের বিবর্তন এবং নতুন

---

২০. ড. আনিস আহমদ : ইসলামি ফিক্র আওর সাকাফাত কী বুনিয়াদেঁ অহি : মাসিক তর্জুমানুল কুরআন, লাহোর, সংখ্যা- ফেব্রুয়ারি ২০০৯।

নতুন অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল। আর এ কারণে এটি সময়ের ব্যবধানে তার অস্তিত্ব হারায় না, বরং সদা সমভাবে কার্যকর।[২১]

ইসলামি শরিয়া ও মানবীয় আইনের পার্থক্য নিম্নরূপ:

| ইসলামি শরিয়া | মানবীয় আইন |
|---|---|
| আল্লাহ প্রদত্ত | মানব রচিত |
| উৎস: কুরআন ও সুন্নাহ | উৎস: সমাজও গোষ্ঠীর আচরণ |
| লক্ষ্য: দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্য ও কল্যাণ লাভ | পার্থিব ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা |
| উদ্দেশ্য: আদর্শ ব্যক্তি ও সমাজ গঠন | উদ্দেশ্য: প্রচলিত সমাজের প্রয়োজন পুরণ |
| সদা সর্বত্র উপযোগী ও বাস্তবায়নযোগ্য | স্থান কাল পাত্র ভেদে উপযোগী |
| শাশ্বত, সার্বজনীন ও পূর্ণাঙ্গ | পরিবর্তনশীল, জাতি গোষ্ঠী শ্রেণীগত, অপূর্ণাঙ্গ |
| আল্লাহ্‌র আইনের কর্তৃত্ব | রাষ্ট্র /জনগণ/বিচারক/ শাসকের কর্তৃত্ব |
| অগ্রগতির সাথে সামঞ্জস্যশীল | অগ্রগতির সাথে পরিবর্তনশীল |
| বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া: আল্লাহভীতি > নৈতিক চেতনা > দন্ড | দন্ড |

## ১৮. ইসলামি শরিয়ার প্রয়োগক্ষেত্র সমূহ

ইসলামি শরিয়া মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবন এবং জীবনের সর্বক্ষেত্র পরিব্যাপ্ত। সুতরাং শরিয়ার প্রয়োগ ক্ষেত্র মানুষের সামগ্রিক জীবন। মৌলিকভাবে ইসলামি শরিয়ার প্রয়োগ ক্ষেত্র সমূহ হলো:

০১. ইবাদত।
০২. আনুগত্য।
০৩. অপরাধ।
০৪. ব্যক্তিগত জীবন।
০৫. পরিবার ও বংশ।
০৬. সামাজিক আচরণ ও পারস্পারিক সম্পর্ক।
০৭. সামগ্রিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্র।
০৮. সামগ্রিক রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র।
০৯. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক।
১০. বিচার ফায়সালা।

---

২১. ইউসুফ আল কারদাভী : শরিয়াতুল ইসলাম খুলূদুহা ওয়া সিলাহুহা লিত তাতবিক ফি কুল্লি যামান ওয়া মাকান।

## ১৯. ইসলামি শরিয়ার প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন

ইসলামি শরিয়ার বাস্তবায়ন প্রসঙ্গটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা অবশ্যি মনে রাখতে হবে। সে কথাগুলো হলো:

১. ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এতে একদিকে যেমন হয়েছে ঈমানিয়াতের (অর্থাৎ বিশ্বাস ও দৃষ্টিভংগির) বিষয়সমূহ, তেমনি এতে রয়েছে আমল, ইবাদত ও মুয়ামালাতের (অর্থাৎ কর্ম, ইবাদত ও পারস্পরিক আচরণের) বিষয়াদি। এই শেষোক্ত বিষয়গুলোই শরিয়ার সাথে সম্পর্কিত।

২. সুতরাং প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের বিষয়টি শুধু শরিয়ার সাথে সম্পর্কিত নয়, বরং বাস্তবায়নের বিষয়টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামের সাথে সম্পর্কিত।

৩. ইসলাম বাস্তবায়নের বিষয়টি কারো খেয়াল খুশিমতো হবে না। এক্ষেত্রে মডেল হিসেবে গ্রহণ করতে হবে স্বয়ং রসূলুল্লাহ সা. কে। আল্লাহ্‌র তত্ত্বাবধানে তিনি যে প্রক্রিয়ায় দীন প্রতিষ্ঠা বা বাস্তবায়ন করেছিলেন, সেটাই দীন প্রতিষ্ঠা বা বাস্তবায়নের একমাত্র অনুমোদিত পন্থা।

এখন প্রশ্ন হলো, রসূলুল্লাহ সা. কী প্রক্রিয়ায় দীন ও শরিয়া বাস্তবায়ন করেছিলেন? তাঁর অবলম্বিত পন্থা পর্যালোচনা করলে সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে, তিনি পাঁচটি স্তরে দীন ও শরিয়া বাস্তবায়ন করেছিলেন। তাঁর অবলম্বিত পন্থার স্তরগুলো ছিলো নিম্নরূপ:

**১. বিশ্বাস ও দৃষ্টিভংগির পরিবর্তন ও পুণর্গঠন:** রসূলুল্লাহ সা. প্রথমেই দাওয়াত, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাঁর জনগণের বিশ্বাস ও দৃষ্টিভংগিতে বিপ্লব সৃষ্টি করেন। তাদের জাহেলি বিশ্বাস ও ধ্যান ধারণা পরিবর্তন করে দেন। আল কুরআন তথা অহির মাধ্যমে প্রাপ্ত ঈমানি বিশ্বাস ও দৃষ্টিভংগি দ্বারা তাদের চিন্তার পুণর্গঠন করেন।

**২. জীবনের লক্ষ্য পরিবর্তন ও পুণর্গঠন:** জ্ঞান, বিশ্বাস ও দৃষ্টিভংগির পরিবর্তনের সাথে সাথে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় তিনি তাঁর লোকদের জীবনের মূল লক্ষ্য পরিবর্তন করে দেন। এতোদিন তাদের জীবনের লক্ষ্য ছিলো, সামাজিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন, অর্থ সম্পদে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন এবং দেব-দেবীদের খুশি করা। এখন তাদের জীবনের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় এক সর্বশক্তিমান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা এবং অনন্ত পারলৌকিক জীবনে সাফল্য অর্জন করা।

**৩. নৈতিক চরিত্রের পরিবর্তন ও পুণর্গঠন:** জীবনের লক্ষ্য পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথে তাঁর সাথিদের নীতি, নৈতিকতা ও চরিত্রের মানদণ্ডও সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে যায়। এতোদিন তারা ছাইকে সোনা ভাবতো। আর এখন তারা সোনাকে ছাইমুক্ত নিখাদ পাকা করার জন্য অগ্নিচুল্লিতে দগ্ধ হতেও দুনির্বার দুঃসাহসী হয়ে দাঁড়ায়।

**৪. সামাজিক পরিবর্তন ও পুণর্গঠন:** পরিবর্তিত বিশ্বাস, দৃষ্টিভংগি, জীবন লক্ষ্য আর নৈতিক চরিত্রের পবিত্র ফলগুধারায় তারা নিজেদের মধ্যে গোড়া পত্তন করেন এক নতুন সমাজের, তৈরি করেন পারস্পরিক

সম্পর্কের নতুন মানবিক আবহ, আচরণের প্রীতিময় সুরভিত বাতায়ন, অর্থ উপার্জন ও ব্যয়ের নৈসর্গিক ধারা এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন ধারায় অনাবিল স্বচ্ছতা।

**৫. রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন ও পুণর্গঠন:** অতপর প্রাণবন্ত সামাজিক শৃঙ্খলায় এবং আইন পালনের স্বগত উদ্দীপনায় উজ্জীবিত এই লোকদের নিয়ে যখন গঠন করা হলো মদিনা কেন্দ্রিক ইসলামি রাষ্ট্র, তখন আইন কার্যকর করার জন্যে রাষ্ট্রকে আইন জারি করা ছাড়া আর তেমন কোনো পদক্ষেপই নিতে হয়নি। প্রতিটি নাগরিক নিজেই আইনের সংরক্ষক হয়ে দাঁড়ায়।

বাংলাদেশ মুসলিম অধ্যুষিত একটি সুপ্রাচীন দেশ। ৮৭% ভাগ মুসলিম হবার কারণে স্বাভাবিক ভাবেই এটি একটি মুসলিম দেশ। আমাদের দেশবাসী ধর্মভীরু।

তবে আমাদের এই মুসলিম সমাজে কিছু ভুল ত্রুটি আছে। সরাসরি কুরআন সুন্নাহর জ্ঞানের অভাবে আমাদের সমাজে ঈমান-আকিদার ক্ষেত্রে, দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে, নৈতিক চরিত্রের ক্ষেত্রে এবং সামাজিক আচরণের ক্ষেত্রে ইসলামের আলো সঠিকভাবে আলোকিত হয় না। এই কমতি যেমন ব্যক্তিগত জীবনে রয়েছে, তেমনি অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনেও রয়েছে।

সুতরাং শুধু কেবল শরিয়া নয়, বরং সামগ্রিক ক্ষেত্রের কমতি দূর করার কাজ অর্থাৎ সামগ্রিক পরিবর্তন ও পুণর্গঠনের কাজই আমাদের করতে হবে। আর এ কাজ কোনো তাড়াহুড়ার কাজ নয়। তাড়াহুড়ার কাজ এবং অনিয়মতান্ত্রিক কাজ কখনো টেকসই হয়না।

আমাদের পর্যবেক্ষণে লক্ষ্য করি, আমাদের ৯৫% আইন কানুন এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাই ইসলামি, কিংবা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কেবল সুদ ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা, কোনো কোনো অপরাধের দন্ড আর খুঁটিনাটি দু'চারটে বিষয়ে সাংঘর্ষিক কিছু বিধি রয়েছে।

বাকি সকল ক্ষেত্রে জনগণ চাইলে ইসলামি শরিয়ার অনুসরণ করতে তাদের জন্যে কোনো বাধা নেই। কিছু কিছু প্রতিবন্ধকতা থাকতে পারে কিছু কিছু লোকের মানসিকতার কারণে। আমাদের দেশে-

১. ইবাদত বন্দেগিতে শরিয়া পালনে রাষ্ট্রীয় বাধা নেই।
২. ব্যক্তিগত আচরণে শরিয়া পরিপালনে বাধা নেই।
৩. সামাজিক আচরণে শরিয়া পরিপালনে বাধা নেই।
৪. অধিকাংশ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে শরিয়া পরিপালনে বাধা নেই।
৫. রাজনৈতিক কর্মকান্ডে শরিয়া পরিপালনে বাধা নেই।
৬. দীনি দাওয়াত ও শিক্ষা সম্প্রসারণে বাধা নেই।
৭. সরকার চাইলে সরকারি কার্যক্রম পরিচালনায় শরিয়া পরিপালনে সাংবিধানিক প্রতিবন্ধকতা নেই।

৮. সরকার চাইলে সুদ ব্যবস্থা পরিবর্তনে বাধা নেই।
৯. যে ক'টি ক্ষেত্রে শরিয়ার সাথে সাংঘর্ষিক ব্যবস্থা রয়েছে, সরকার চাইলে সেসব ক্ষেত্রে শরিয়া বিধি প্রবর্তনে বাধা নেই।

মূলত আমাদের দেশে বড় সমস্যা হলো:

১. জানার অভাব, সঠিক উৎসের জ্ঞানের অভাব, সচেতনতার অভাব।
২. সঠিক ও দীর্ঘ মেয়াদি কর্মসূচি নিয়ে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় কাজ করে যাওয়ার অভাব।

তৃণমূল থেকে দীন ও শরিয়ার পর্যায়ক্রমিক সচেতনতা সৃষ্টি, সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়নের কার্যক্রম জোরদার করা দরকার।

তাড়াহুড়া করে, কিংবা সন্ত্রাসী কায়দায়, কিংবা অনিয়মতান্ত্রিক পন্থায়, অথবা কোনো না কোনো ভাবে হঠাৎ ক্ষমতায় আরোহন করে সামগ্রিক পরিবর্তন ও পূণর্গঠন সম্ভব নয়।

এ জন্যে ধৈর্যের সাথে জ্ঞান, বুদ্ধিবৃত্তি ও আধুনিক টেকনোলজির ময়দানে কাজ করা দরকার। মানুষের জ্ঞান, মানসিকতা ও চরিত্র বদলের কাজ করা দরকার।

**২০. শরিয়ার গুরুত্ব ও অখন্ডতা**

ইসলামি শরিয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে কুরআনে ব্যাপক আলোচনা এসেছে। এখানে মাত্র কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করছি:

اِتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ •

অর্থ: তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট যা (যে বিধান) নাযিল করা হয়েছে তোমরা কেবল তারই অনুসরণ করো, তাঁকে ছাড়া অন্যদের অভিভাবক বানিয়ে নিয়ে তাদের অনুসরণ করোনা। তবে তোমরা কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো। (সূরা ৭ আল আ'রাফ: আয়াত ৩)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ •

অর্থ: আল্লাহ এবং তাঁর রসূল যখন কোনো বিষয়ে ফায়সালা প্রদান করেন, তখন আর সে বিষয়ে ভিন্ন কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ কোনো মুমিন পুরুষ বা নারীর নেই। (সূরা ৩৩ আল মায়িদা: আয়াত ৩৬)

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ •

অর্থ: যারা আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনা তারা কাফির। (সূরা ৫ আল মায়িদা: আয়াত ৪৪)

শরিয়া ছাড়া ইসলাম পরিপালন করার কোনো সুযোগ নেই। যেমন: নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, বিচার, অর্থনীতি, রাষ্ট্র পরিচালনা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে।

দীন ও শরিয়া তথা ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের নির্দেশই আল কুরআনে দেয়া হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ •

Trans.: O ye who believe! Enter perfectly in Islam (by obeying all the rules and regulations of Islam); and follow not the footsteps of the Shaitan. (Al Quran 2: 206)

ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত পরিপূর্ণ (perfect) জীবন বিধান। ইসলামি শরিয়া আল্লাহ প্রদত্ত নির্ভুল আইন। আল্লাহ্‌র আইন পালনের ক্ষেত্রে মুমিনদেরকে কোনো প্রকার ইচ্ছার স্বাধীনতা (freedom of choice) দেয়া হয়নি। ইচ্ছা মাফিক বা সুবিধা মাফিক কিছু অংশ পালন করার এবং কিছু অংশ পালন না করার সুযোগ আল্লাহ তায়ালা কাউকেও দেননি। মহান আল্লাহ বলেন:

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ •

অর্থ: তোমরা কি আল্লাহ্‌র কিতাবের কিছু অংশ মানবে আর কিছু অংশ অমান্য করবে? তোমাদের মধ্যে যারাই এমনটি করবে তাদের একমাত্র পরিণাম হবে পৃথিবীর জীবনে হীনতা আর লাঞ্ছনা এবং কিয়ামতের দিন তারা নিক্ষিপ্ত হবে কঠিনতম আযাবে। আল্লাহ তোমাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে অনবহিত নন। (সূরা ২ আল বাকারা: আয়াত ৮৫)

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۙ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ • إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ •

অর্থ: নিশ্চয়ই যারা আমার নাযিল করা প্রমান ও হিদায়াত (দীন ও শরিয়া) গোপন করে, আমি তা কিতাব আকারে মানব সমাজের জন্যে প্রকাশ করা পর, তাদের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করেন স্বয়ং আল্লাহ্ এবং তাদের অভিশাপ দেয় অভিশাপদানকারীরা। তবে অভিশাপ থেকে মুক্ত হয় তারা, যারা তওবা করে (অনুতপ্ত হয়), নিজেদের সংশোধন করে নেয় এবং মানুষের মাঝে সত্য প্রকাশ করে। আমি এদের তওবা কবুল করবো, কারণ আমি তওবা কবুলকারী দয়াময়। (সূরা ২ আল বাকারা: আয়াত ১৫৯-১৬০)

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا • أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا •

অর্থ: যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলদের অমান্য করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলদের (হুকুমের মধ্যে) পার্থক্য সৃষ্টি করে আর বলে: 'আমরা এগুলো মানবো এবং এগুলো মানবোনা'; তাছাড়া তারা মাঝামাঝি কোনো পথ অবলম্বন করতে চায়; মূলত এরাই প্রকৃত কাফির। আর আল্লাহ এ ধরণের কাফিরদের জন্যে তৈরি করে রেখেছেন অপমানকর শাস্তি। (সূরা ৪ আন নিসা: আয়াত ১৫০)

## ২১. শরিয়া অধ্যয়ন সংক্রান্ত পরামর্শ

যারা শরিয়া সম্পর্কে অধ্যয়ন করতে চান, তাদের এই মৌলিক বিষয়গুলো জানতে ও অনুসরণ করতে হবে:

১. শরিয়ার উৎস: আল কুরআন ও সুন্নতে রসূল বা হাদিসে রসূল।

২. শরিয়া নির্দেশক প্রয়োজনীয় আয়াত ও হাদিসের ব্যাখ্যা, ইজতিহাদ ও বিধান নির্ণয়ের মূলনীতি সংক্রান্ত শাস্ত্রের নাম উসূল আল ফিক্হ।

৩. শরিয়ার বিধান সমূহের বিবরণ সম্বলিত শাস্ত্রের নাম ফিক্হ।

৪. যারা সঠিকভাবে শুধুমাত্র শরিয়ার অনুসরণ করতে চান তাদের 'উসূল আল ফিক্হ' অধ্যয়ন না করলেও চলে। কিন্তু যারা শরিয়ার বিস্তারিত জ্ঞানার্জন করতে চান এবং শরিয়া সম্পর্কে পারদর্শী হতে চান তাদেরকে আল কুরআন, হাদিস, উসূল আল ফিক্হ এবং ফিক্হের গ্রন্থাবলী মনোযোগ সহকারে স্টাডি করতে হবে।

আল কুরআনের বিধান (শরিয়া) সম্বলিত আয়াতসমূহ আলাদাভাবে অনেকেই তফসিরসহ সংকলন করেছেন। এরকম কয়েকটি তফসির গ্রন্থ হলো:

১. আহমদ ইবনে আলী আল জাস্সাস্: আহকামুল কুরআন, এ গ্রন্থটি

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করেছেন।

২. আলী ইবনে মুহাম্মদ তাবারি: আহকামুল কুরআন।
৩. জালালুদ্দিন সুয়ূতি: আল ইকলিল ফী ইস্তিম্বাতিত তানযিল।
৪. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল আরাবি: আহকামুল কুরআন।
৫. মুহাম্মদ ইবনে আহমদ কুরতুবি: জামেউল আহকাম।
৬. মুহাম্মদ আলী আস্‌সাবুনি: আহকামুল কুরআন।

বিধান সম্বলিত হাদিস বা সুন্নাহর সংকলনও করেছেন অনেকেই। যেমন:

১. হাফিয ইবনুল কায়্যিম: যাদুল মা'আদ
২. হাফিয ইবনু হাজর আসকালানি: বুলুগুল মুরাম

উসূল আল ফিক্‌হ বিষয়ে সর্বপ্রথম গ্রন্থ রচনা করে ইমাম শাফেয়ী। তাঁর গ্রন্থের নাম 'আর রিসালাহ'। পরবর্তীতে এ বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এযাবত বাংলা ভাষায় অনূদিত কয়েকটি উসূল আল ফিকহের গ্রন্থ: ১. মোল্লা জিইউন: নূরুল আনওয়ার ২. তাহা জাবির আলওয়ানি: উসূল আল ফিক্‌হ।

ফিকহের গ্রন্থাবলী প্রচুর। অনেক ফকীহ্ ফিকহের গ্রন্থ লিখেছেন, অনেকে সংকলন করেছেন। বাংলা ভাষায় অনূদিত কয়েকটি ফিকহের গ্রন্থ হলো:

১. বুরহানুদ্দীন ফরগনানী: আল হিদায়া, ২. সাইয়েদ সাবেক: ফিকহুস্ সুন্নাহ, ৩. আল্লামা ইউসুফ আল কারদাভী: ইসলামে হালাল হারামের বিধান, ৪. আবুল আ'লা মওদূদী: রাসায়েল ও মাসায়েল, ৫. আল্লামা আতাইয়া খামিস: মহিলা ফিক্‌হ, ৬. ইউসুফ ইসলাহী: আসান ফিকাহ

**উসূল আল ফিক্‌হ:** উসূল আল ফিক্‌হ হলো সেইসব নীতিমালা- একজন ফকীহ যেগুলোর ভিত্তিতে দলিল গ্রহণ করে শরিয়তের বিধান নির্ণয় করেন। উসূলে ফিক্‌হ হলো ফিকহের ভিত্তি। উসূলের ভিত্তিতেই ফকিহ দলিল প্রমাণ গ্রহণ করেন। এরি ভিত্তিতে তিনি কুরআনকে সুন্নাহর উপর, সুন্নাহকে কিয়াসের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করেন। এরি ভিত্তিতে তিনি সুন্নাহ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে একটি হাদিসকে আরেকটির উপর অগ্রাধিকার প্রদান করেন। এরি ভিত্তিতে একটি ইজতিহাদি মতকে আরেকটির উপর অগ্রাধিকার প্রদান করেন। অথবা কোনোটি খন্ডণ করেন।

**ফিক্‌হ:** ইমাম মুহাম্মদ আবুয্ যুহরার মতে ফিক্‌হ হলো: সেই শাস্ত্র যার মাধ্যমে দলিল প্রমাণসহ শরিয়তের কর্ম ও আচরণগত বিধান সমূহ জানা যায়।*

* পুস্তিকাটি মূলত ১৬ এপ্রিল ২০১০ তারিখে বিয়াম অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা সোসাইটির টট ক্লাসে প্রদত্ত বক্তব্য।

## সহায়ক গ্রন্থাবলিঃ


০১. আল কুরআন
০২. বিভিন্ন তাফসির গ্রন্থ
০৩. সহীহ আল বুখারি
০৪. সহীহ মুসলিম
০৫. মিশকাতুল মাসাবিহ
০৬. ইবনে তাইমিয়া: ফাতওয়ায়ে ইবনে তাইমিয়া
০৭. ইমাম শাফেয়ী: আর রিসালাহ
০৮. ইমাম মুহাম্মদ আবুয যুহ্‌রা: উসূল আল ফিক্‌হ
০৯. মোল্লা জুয়ুন: নূরুল আনওয়ার
১০. আল জাস্‌সাস: আল উসূল ফিল ফুসূল
১১. ইবনু হাযম: আল মুহাল্লা
১২. ইবনুল কায়্যিম: যাদুল মায়াদ
১৩. আল গায্‌যালি: আল মুস্তাফা
১৪. শহীদ আবদুল কাদের আওদা (মিশর): আত্ তাশরিউল জানাহি ফিল ইসলাম ১ম খন্ড
১৫. শহীদ আবদুল কাদের আওদা (মিশর): আল ইসলাম বাইনা জাহ্‌লে আবনায়িহি ওয়া ইজ্‌যে উলামাইহি।
১৬. ড. ইউসুফ আল কারদাভী: শরিয়াতুল ইসলাম: খুলূদুহা ওয়া সিলাহুহা লিত তাতবিক ফি কুল্লি যামান ওয়া মাকান।
১৭. ড. ইউসুফ আল কারদাভী: আল হালাল ওয়াল হারাম
১৮. শাহ অলি উল্লাহ দেহলভী: মতবিরোধ পূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়
১৯. আবুল আ'লা মওদূদী: ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান
২০. আবুল আ'লা মওদূদী: তাফহিমাত ৩য় খন্ড
২১. আবুল আ'লা মওদূদী: রাসায়েল ও মাসায়েল
২২. আবুল আ'লা মওদূদী: Towards Understanding Islam.
২৩. মাওলানা গাওহার রহমান: ইজতিহাদ আওর আওসাফে মুজতাহিদ
২৪. ড. এম. উমর চাপরা: Islam & the Economic Challenge.
২৫. ড. মুস্তফা সিবায়ী: আস সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ফিত্ তাশরিয়িল ইসলামি
২৬. সাইয়েদ সাবেক: ফিকহুস্ সুন্নাহ
২৭. মুহাম্মদ বিন সালেহ আল উসাইমিন: আল জামেউল আহকাম ফিকহুস সুন্নাহ্
২৮. মুহাম্মদ আবদুর রহিম: ইসলামি শরিয়তের উৎস
২৯. ড. আনিস আহমদ: ইসলামি ফিক্‌র আওর সাকাফাত কী বুনিয়াদেঁ: অহি, মাসিক তর্জমানুল কুরআন, লাহোর, সংখ্যা- ফেব্রুয়ারি ২০০৯।
৩০. তাহা জাবির আল আলওয়ানি: উসূল আল ফিক্‌হ আল ইসলামি (ইংরেজি)
৩১. মুহাম্মদ তাকী আমীনী: ইসলামী ফিক্‌হের পটভূমি ও বিন্যাস
৩২. ড. আবদুল করিম জায়দান: আল ফারদু ওয়াদ দাওলা ফিশ্ শারিয়াতিল ইসলামিয়া